ইসলামের অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী

IN BENGALI

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)

নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা

প্রকাশনায় :

নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান

ইসলামের অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)
নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা

প্রকাশনায় :
নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান

পুস্তকের নাম	:	ইসলামের অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী
Name of book	:	Some Distinctive Features of Islam
লেখক	:	হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) নিখিল-বিশ্ব আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা
Author	:	Hazrat Mirza Tahir Ahmad RH Khalifatul Masih IV
অনুবাদক	:	শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ
Translator	:	Shah Mustafizur Rahaman, Bangladesh
সম্পাদনায়	:	বাংলা ডেস্ক, কাদিয়ান
Edited by	:	Bangla Desk Qadian
সংস্করণ	:	প্রথম সংস্করণ (বাংলা) সেপ্টেম্বর ২০২৩
Edition. Year	:	1st Edition (Bengali) September 2023
সংখ্যা	:	৫০০
Quantity	:	500
প্রকাশক	:	নাযারত নশর ও এশায়াত,সদর আঞ্জুমান আহ্মদীয়া ,কাদিয়ান,গুরদাসপুর,পঞ্জাব- 143516
Publisher	:	Nazarat Nashr-o-Isha'at, Qadian-143516 Distt. Gurdaspur, (Punjab)
মূদ্রণ	:	ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান,গুরদাসপুর,পঞ্জাব- 143516
Printed at	:	Fazl-e-Umar Printing Press, Qadian, 143516 Distt. Gurdaspur (Punjab)

লেখক পরিচিতি

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) (১৯২৮-২০০৩) ছিলেন একজন ঐশী আশীর্বাদধন্য ব্যক্তি, যুগের কণ্ঠস্বর, একজন মহান বক্তা, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী বিজ্ঞ পণ্ডিত এবং প্রসিদ্ধ ও বহুমুখী লেখক। তুলনামূলক ধর্মের একজন বিচক্ষণ শিক্ষার্থীও ছিলেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী আলায়হেস্ সালামের চতুর্থ খলীফা হওয়ায় বিশ্বব্যাপী আহমদী মুসলিমরা তাঁকে তাদের ইমাম, আধ্যাত্মিক প্রধান হিসাবে ভালবাসতেন এবং ভক্তি সহকারে অনুসরণ করতেন। ১৯৮২ সালে তিনি খলীফাতুল মসীহ্ নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৮৪ সালের ২৬শে এপ্রিল জেনারেল জিয়া-উল হক আহমদীয়া বিরোধী অধ্যাদেশ জারি করার পর তাঁকে তাঁর প্রিয় স্বদেশভূমি পাকিস্তান ছেড়ে ইংল্যান্ডে চলে যেতে হয়েছিল। সেখানে তিনি মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল (এমটিএ) এর সূচনা করেছিলেন যা এখন বিশ্বব্যাপী ২৪ ঘন্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে চলেছে।

একজন ধর্মীয় নেতা হওয়ার পাশাপাশি, তিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, অত্যন্ত প্রতিভাধর কবি ও একজন ক্রীড়াবিদও ছিলেন।

ভারতের কাদিয়ানের স্কুলে তিনি তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। এরপর লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে যোগ দেন, এবং

'জামেয়া আহমদীয়া' থেকে স্নাতক হওয়ার পর পঞ্জাব ইউনিভার্সিটি, লাহোর থেকে আরবি ভাষায় অনার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তিতে তিনি ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিস, ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন থেকে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন।

তাঁর বিদ্যার্জনের বিশাল পরিধি সমভাবে আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব ব্যাপক বিষয়ে বিস্তৃত ছিল। তিনি ছিলেন ঐশীভাবে অনুপ্রাণিত এবং কুরআনের গভীর বুৎপত্তি অর্জনকারী। পবিত্র কুরআন তিনি উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তিনি হযরত মৌলভী শের আলী (রা.) কর্তৃক পবিত্র কুরআনের ইংরেজি অনুবাদে আংশিকভাবে সংশোধন ও ব্যাখ্যামূলক টীকা যোগ করেন। Revelation, Rationality, Knowledge and Truth (ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য) গ্রন্থটি হল তাঁর মহান রচনা।

যদিও দর্শন ও বিজ্ঞানে তাঁর কোন প্রথাগত শিক্ষা ছিল না, তবু তাঁর মন ছিল দার্শনিক সুলভ আর সর্বাধিক কঠিন ও দুর্বোদ্ধ তত্ত্বগত দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সহজে সমাধান করেছেন। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদা যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক ছিল। একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে তাঁর বিজ্ঞান, বিশেষ করে জীবন বিজ্ঞান সম্পর্কে আশ্চর্যজনকভাবে গভীর জ্ঞান ছিল যা তাঁকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। মানব মনস্তত্ত্বেও তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। তাঁর ছিল উচ্চ বুদ্ধিমত্তার একটি বিশ্লেষণাত্মক মন– এমন একটি বুদ্ধিমত্তা যা ছিল প্রতিভায় উদ্ভাসিত, সহজে সবচেয়ে জটিল সমস্যাগুলি সমাধান করতে সক্ষম, যা তাঁর শ্রোতা ও পাঠকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল।

সূচিপত্র

বর্তমান সংস্করণের ভুমিকা.................................VII
সত্যে কারো একচেটিয়া অধিকার নেই..................4
একটি সার্বজনীন ধর্ম..7
ধর্মসমূহের পার্থক্য, বৈপরীত্য ও সেগুলির যথার্থতা....9
একটি চিরন্তন ধর্ম...12
কুরআনের হেফাযত...13
একটি সম্পূর্ণ ধর্ম...16
যাকাত বনাম সুদ...17
রাজনৈতিক নির্দেশাবলী.....................................19
ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের ইসলামী ধারণা.................23
আরও কিছু বৈশিষ্ট্য..28
একটি শান্তির ধর্ম 33
আহ্‌মদীয়া আন্দোলন..35
পরিশিষ্ট...38

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বর্তমান সংস্করণের ভূমিকা

'ইসলামের অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী'- হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) কর্তৃক অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত একটি ঐতিহাসিক বক্তৃতা। বক্তৃতাটি পুস্তিকাকারে সর্বপ্রথম ১৯৮৫ সালে যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

বক্তা তাঁর এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটিতে ইসলামের স্বতন্ত্র অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি মূলত দুই প্রকার বলে বর্ণনা করেছেন ঃ

প্রথমত, এটিই একমাত্র ধর্ম যা দাবি করে যে এটি সর্বকালের জন্য এবং সমস্ত মানুষের জন্য চূড়ান্ত, সর্বজনীন ও শাশ্বত ধর্ম। দ্বিতীয়ত, এটিই একমাত্র ধর্ম যা অন্য সকল ধর্মের সত্যতা স্বীকার করে তাদের সাক্ষ্য দেয় এবং দাবি করে যে সত্য কেবল ইসলামের একচেটিয়া নয় – যেখানে অন্য সব ধর্মই এককভাবে শুধু নিজেকে ঐশী সত্যের ধারক বলে দাবি করে। অতঃপর তিনি (রাহে.) সবিস্তারে এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন যে, সকল ধর্মই যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয় তবে ধর্মের মধ্যে এত বৈপরীত্য কেন? তদুপরি তিনি যুক্তি সহ প্রমাণ উপস্থাপন করেন যে ইসলামী শিক্ষা শুধুমাত্র সার্বজনীন ও শাশ্বত নয় বরং সম্পূর্ণ, ব্যাপক ও নিখুঁত, এবং পবিত্র কুরআন হল আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় বাণী যা মানুষের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয় থেকে মুক্ত; এবং ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন নবীগণের সীলমোহর ও তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।

বক্তৃতার মাঝামাঝি অংশে তিনি ইসলামের সতেরোটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেন যা একে অন্যান্য ধর্ম ও মতাদর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে,

যার মধ্যে রয়েছে ইসলামের ন্যায়বিচারের ধারণা এবং সরকারের গঠন ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা।

শেষ পর্যায়ে বক্তা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর লেখনী হতে কতিপয় উদ্ধৃতি পাঠ করে তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন এবং উপস্থিত সভ্যমন্ডলীর সাথে আহমদীয়া জামা'ত এবং জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার পরিচয় করিয়ে দেন।

অসাধারণ এই নিবন্ধটির প্রথম বাংলা অনুবাদ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯১ইং সালে বাংলাদেশ থেকে। অনুবাদ করেন জনাব শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান। বর্তমান সংস্করণে পুস্তিকাটির কম্পোজ, প্রুফ রিডিং এবং রিভিউ করেছেন যথাক্রমে মোকররমা বুশরা হামীদ সাহেবা, জনাব সেখ হুমায়ুন কবীর মুরব্বী সিলসিলাহ্ এবং মোকররমা সাজিদা খাতুন সাহেবা। পুস্তিকাটির সর্বতোভাবে পরিমার্জনা করেছেন জনাব সেখ মুহাম্মদ আলী সেক্রেটারী এশায়াত কমিটি পশ্চিমবঙ্গ ও জনাব জাহিরুল হাসান, ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান।

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) এর সদয় অনুমোদনে বক্তৃতাটির বাংলা অনুবাদ পুস্তিকাকারে নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হচ্ছে।

আল্লাহ্ তাআলা সকলকে এই বক্তৃতার বাণীকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা এবং এর দ্বারা যথাসম্ভব লাভবান হওয়ার তৌফিক প্রদান করুন। আমিন।

বিনীত

সেপ্টেম্বর ২০২৩ হাফিয মখদুম শরীফ

নাযির নশর ও এশায়াত কাদিয়ান

ইসলামের
অনন্য সাধারণ
বৈশিষ্ট্যাবলী

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ

وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔ *

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর নিখিল বিশ্ব জামা'ত আহমদীয়ার ইমাম বলেন ঃ

---

* আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল। বিতাড়িত শয়তানদের নিকট থেকে আমি আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি জগৎ সমূহের প্রতিপালক, অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়, বিচার দিবসের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। তুমি আমাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর, তাদের পথে যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ, কোপগ্রস্থদের পথে নয়, এবং পথভ্রষ্টদেরও পথে নয়। [প্রকাশক]

সত্যে কারো একচেটিয়া অধিকার নেই

ইসলামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এর বিশেষ যে বৈশিষ্ট্যটি আমার কাছে সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক আকর্ষণীয় বলে মনে হচ্ছে, তা হলো ঃ সত্যের উপরে ইসলামের একচেটিয়া অধিকার থাকার অতি কাঙ্ক্ষিত দাবী পরিত্যাগ, এবং সেই সঙ্গে এই দাবীও ত্যাগ যে, সত্য অন্য আর কোন ধর্মে নেই। ইসলাম এই দাবীও করে না যে, কেবলমাত্র আরবরাই আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভ করেছে। ইসলামই হচ্ছে এরূপ একমাত্র ধর্ম যা এই ধারণাটা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে যে, সত্য কোন বিশেষ ধর্মের, বিশেষ গোত্রের বা জাতির একচেটিয়া ব্যাপার। পক্ষান্তরে, ইসলাম দৃঢ়তার সঙ্গে এই ঘোষণা দেয় যে, ঐশী-নির্দেশনা বা পথ-প্রদর্শন হচ্ছে এমন এক অবারিত ঐশ্বর্য যা যুগে যুগে মানবতাকে সমুন্নত রেখেছে। পবিত্র কুরআন আমাদেরকে বলে যে, দুনিয়াতে এমন কোন গোত্র বা জাতি নেই যা ঐশী-হেদায়াত বা সৎপথ প্রদর্শনের শিক্ষায় আশিসমন্ডিত হয়নি। এবং পৃথিবীর বুকে এমন কোন অঞ্চল নেই বা এমন কোন জাতি বা গোত্র নেই যা আল্লাহ্ তাআলার কোন না কোন নবী বা রসূলকে গ্রহণ করেনি - (আল্ কুরআন 35:25)।

দুনিয়ার সকল জাতির উপরে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রকাশের এই বিশ্বজনীন ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীতে আমরা একটা ব্যাপার লক্ষ্য করি যে, পৃথিবীর অন্য আর কোন ধর্মের কোন ধর্মগ্রন্থ এই প্রত্যয়ন করে না, এমন কি এই ইঙ্গিতও দান করে না যে, অন্য কোন জাতি বা অন্য কোন দেশ ইতিহাসের কোন পর্যায়ে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আলো বা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছিল বা প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা এখনও

রয়েছে।

কোন একটি স্থানীয় বা আঞ্চলিক ধর্মের সত্যতা ও প্রামাণ্যতার কথা যত জোরের সঙ্গে পেশ করা হয়েছে ঠিক তত জোরের সঙ্গেই অন্যান্য ধর্মের সত্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে; যেন দুনিয়ার সকল অধিবাসীদের বাদ দিয়ে খোদাতাআলা শুধু একটি মাত্র ধর্মের এবং একটি মাত্র জাতি বা গোত্রের রক্ষাকারী, যেন সত্যের সূর্য শুধু মাত্র বিশেষ একটি দেশের দিগন্তেই উদিত হয়েছিল এবং অস্তমিত হয়েছিল, বাদবাকী পৃথিবীটাকে বঞ্চিত রেখেছিল। বলতে কি বাদবাকী পৃথিবীটাকে একেবারে পরিত্যাগ করেছিল এবং চিরন্তন অন্ধকারে নিমজ্জিত রেখেছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, বাইবেল শুধু ইসরাঈলের খোদার কথাই বলে এবং বারংবার বলে ঃ

'মহিমান্বিত হউক প্রভু যিনি ইসরাঈলের ঈশ্বর'– (বংশাবলি 1 -16:36)।

বাইবেল অন্যান্য জাতির বা দেশের প্রতি অবতীর্ণ ঐশীবাণীর কোন উল্লেখ করে না, এমন কি প্রসঙ্গক্রমেও না। সুতরাং ইহুদীদের যে বিশ্বাস,- সমস্ত ইসরাঈলী নবী প্রেরিত হয়েছিলেন শুধু ইসরাঈলী গোত্রগুলোর জন্যেই, তা বাইবেলের লক্ষ্য ও বাণীর সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। যীশুও তাই ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র হীব্রু গোত্রগুলোকে হেদায়াত দান করা। তিনি বলেছেন ঃ

'আমি প্রেরিত হয়েছিলাম ইসরাঈলের হারানো মেষগুলোর জন্যে'– (মথি 15:24)। এবং তিনি তাঁর শিষ্যগণকে ভৎর্সনা করে বলেছিলেন ঃ

'যা পবিত্র তা কুকুরগুলোকে দিও না; এবং তোমাদের

মুক্তোগুলোকে শূকরের সামনে ছুঁড়ে ফেল না।' – (মথি- 15:21-25)।

অনুরূপভাবে, হিন্দুধর্ম তার গ্রন্থগুলোতে বক্তব্য রেখেছে কেবল উচ্চ বর্ণের লোকদের উদ্দেশ্যেই। বলা হয়েছে ঃ 'যদি নিম্ন বর্ণের কোন লোক বেদের কোন শ্লোক দৈবাৎ শুনে ফেলে তাহলে রাজার কর্তব্য গলিত সীসা বা মোম দ্বারা তার কান বন্ধ করে দেয়া। সে যদি ধর্মগ্রন্থের কোন বাণী পাঠ করে, তাহলে তার জিহ্বা কেটে ফেলতে হবে, এবং সে যদি বেদ পাঠ করে, তাহলে তার দেহকে কেটে টুকরো টুকরো করতে হবে'। – (গোতমঃ স্মৃতি ঃ 12)।

আমরা যদি এই ধর্ম গ্রন্থগুলোর এই জাতীয় কঠোর আদেশাবলীকে উপেক্ষাও করি, কিংবা এগুলোর অন্যরকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করি, তথাপি এই সত্যটা স্বীকার করতেই হবে যে, এই সব ধর্মের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থগুলো কোনমতেই অন্য দেশ বা জাতির কোন ধর্মীয় সত্যের প্রতি স্বীকৃতি জানায়নি। এ ক্ষেত্রে আসল যে প্রশ্নটি দেখা দেয় তা হচ্ছে,- এই সব ধর্ম যদি সত্য হয়েও থাকে, তাহলে সেগুলোর সীমাবদ্ধ এবং কঠোর গন্ডিবদ্ধ বাণীর দ্বারা খোদার পরিচয় তুলে ধরার মধ্যে কি কোন প্রজ্ঞা নিহিত ছিল? কুরআন এই সমস্যার একটা তাৎক্ষণিক সমাধান দেয় এবং বলে যে, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেও বা পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.) এর পূর্বেও নবী রসূলদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল পৃথিবীর প্রতিটি জাতি ও দেশের মধ্যে। তবে তাঁদের প্রত্যেকের পরিধি ছিল আঞ্চলিক এবং দায়িত্ব সাময়িক। তার কারণ ছিল এটাই যে, তখনও পর্যন্ত মানবসভ্যতা উন্নতির এমন কোন পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে নি, যে পর্যায়ে একজন সার্বজনীন

নবীকে সার্বজনীন বাণীসহ প্রেরণ করা যেত।

একটি সার্বজনীন ধর্ম

কুরআন করীমের প্রথম পৃষ্ঠাতেই যে রব্ বা প্রভুর প্রশংসা করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন সকল জগতের পালনকর্তা ও লালনকর্তা। এবং এই গ্রন্থের শেষের পরিচ্ছেদে আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সমগ্র মানবজাতির প্রভুর সমীপে প্রার্থনা করার। সুতরাং, পবিত্র কুরআনের প্রথম কথায় এবং শেষের কথায় এমন এক খোদার ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের খোদা, যিনি শুধু আরবদের বা মুসলমানদেরই খোদা নন। এটা নিশ্চিত যে, ইসলামের পবিত্র নবী (সা.) এর পূর্বে অন্য আর কোন নবীই সমগ্র মানব জাতিকে পথ নির্দেশ দান করেন নি এবং পবিত্র কুরআনের পূর্বেকার কোন ধর্মগ্রন্থই সমগ্র বিশ্বকে সম্বোধন করে কিছু বলে নি। এইরূপ সার্বজনীন দাবী প্রথম করা হয় ইসলামের নবীর পক্ষে, এই বলে ঃ

"এবং আমরা তোমাকে বিনা ব্যাতিক্রমে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি; কিন্তু অধিকাংশ লোক তাহা জানে না।" (আল্ কুরআন 34:29)

"তুমি বল, হে মানবজাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য সেই আল্লাহ্র রসূল, যিনি আকাশমালা ও পৃথিবীর আধিপত্যের অধিকারী। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ নাই, তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। অতএব, তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্র উপর এবং তাঁহার রসূল উম্মী নবীর উপর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ্ এবং তাঁহার বাণীসমূহের উপর, এবং তোমরা তাহাকে অনুসরণ কর যেন

তোমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হও” (আল্ কুরআন 7:159)। এবং যখন - কুরআনও তার নিজের সম্পর্কে এই দাবী পেশ করে ঃ

“ইহা সকল জগতের জন্য এক উপদেশবাণী ব্যতীত কিছু নহে”- (আল্ কুরআন 81:28)।

কুরআনকে বার বার অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলোর ‘যাচাইকারী’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এবং মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন অন্যান্য নবীগণের উপরেও ঈমান রাখে ঠিক সেইভাবে যেভাবে তারা ঈমান রাখে তাদের নিজেদের নবীগণের উপরে। এবং তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে- নবীগণের মধ্যে একদলকে মেনে আর অন্যদলকে না মেনে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করতে।

“এই রসূল, স্বয়ং ঈমান রাখে উহার উপর যাহা তাহার প্রতি তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে নাযেল করা হইয়াছে এবং অপরাপর মুমেনগণও; তাহারা সকলেই আল্লাহ্ এবং তাঁহার ফিরিশ্তা এবং তাঁহার কিতাবসমূহ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান রাখে; (এবং তাহারা বলে) আমরা তাঁহার রসূলগণের কাহারও মধ্যে কোন পার্থক্য করি না; এবং তাহারা বলে, আমরা শ্রবণ করিলাম এবং আমরা আনুগত্য করিলাম; হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, এবং তোমারই নিকট প্রত্যাবর্তন।” (আল্ কুরআন 2:286)।

এটা পরখ করে দেখা নিরর্থক নাও হতে পারে যে,- ‘সার্বজনীনতা’- কোন বাঞ্ছিত বিষয় কি না; এর প্রতি ইসলাম কেনই বা এত বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, ইসলাম প্রথম যখন

মানবতার ঐক্যের বাণী ঘোষণা করেছে, তখন থেকেই সর্বক্ষেত্রে অনুরূপ এক ঐক্যের প্রতি ধাবিত হওয়ার গতি দ্রুততর হয়ে চলেছে। এইসব অগ্রগতির একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে,- আমাদের এই যুগে বিভিন্ন ধরণের আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংঘের প্রতিষ্ঠা হওয়া। বস্তুতঃ এগুলো হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুদীর্ঘ ও সর্পিল যাত্রা পথের বিভিন্ন মাইল ফলক। সুতরাং, আজকের দুনিয়ার উন্নত ও সভ্য মানুষ যে প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করছে, তা পূর্ণ করা হয়েছে চৌদ্দ শ' বছর পূর্বেই ইসলামের বাণীর মধ্যে- যে বাণীতে উপ্ত করা আছে সেই সমস্যার সমাধানের বীজ। আজকের দিনে, ভ্রমণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি হওয়াতে সেই ঐক্যের লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে বিশ্বের সকল দেশ ও সকল জাতির অগ্রগতিতে একটা নতুন বেগের সঞ্চার হয়েছে।

ধর্মসমূহের পার্থক্য, বৈপরীত্য ও সেগুলির যথার্থতা

একটা প্রশ্ন উঠে যে, সত্য সত্যই যদি সকল ধর্ম খোদা তাআলার নবীদের দ্বারাই প্রবর্তিত হয়ে থাকে, তাহলে সেগুলোর শিক্ষার মধ্যে এত পার্থক্য কেন? একই খোদা কি ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা প্রবর্তন করতে পারেন? এই প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছে একমাত্র ইসলাম। এবং এই বিষয়টিও ইসলামের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইসলাম বলে, বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষার মধ্যেকার পার্থক্যের কারণ হচ্ছে দুটিঃ এক,- ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশ ও বিধি ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়েছিল, তাই সর্বপরিজ্ঞাত ও সর্বজ্ঞানী খোদা বিভিন্ন যুগের, অঞ্চলের ও জাতির জন্যে তাদের প্রয়োজনমত বিভিন্ন শিক্ষা দান করেছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ কালের প্রবাহে বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষামালা অপসৃত হয়েছে বা নষ্ট হয়ে গেছে, কাজেই সেগুলোর প্রকৃত রূপ সংরক্ষিত থাকতে পারে নি। কোন কোন ক্ষেত্রে অনুসারীরাই তাদের প্রয়োজন মাফিক নতুনত্বের আমদানী করেছে, তারতম্যেরও সৃষ্টি করেছে; এবং এভাবেই তাদের উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে মূলগ্রন্থগুলোতে প্রক্ষেপ সাধন করা হয়েছে। কাজে কাজেই, ঐশীবাণীর মধ্যকার ইত্যাকার প্রক্ষেপ ও সংমিশ্রণ নতুন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে অপরিহার্য করে তুলেছে। যেমন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

"তাহারা (কিতাবের) শব্দগুলিকে উহাদের আসল স্থান হইতে অদল বদল করিতেছে এবং যে বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল উহার কতক অংশ তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে।" (আল্ কুরআন 5:14)

আমরা যদি কুরআন প্রদত্ত নীতিমালার আলোকে বিভিন্ন ধর্মের পার্থক্যের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দেখতে পাব যে, আমরা মূল বা আসলের যত কাছাকাছি পৌঁছাব, পার্থক্যগুলো তত কমে আসতে থাকে। যেমন, আমরা যদি খৃষ্টধর্মের সহিত ইসলামের তুলনা করি এবং তা সীমাবদ্ধ রাখি কেবল যীশুর জীবন ও সুসমাচার চারটির মধ্যে, তা হলে আমরা কুরআন ও বাইবেলের মূল শিক্ষার মধ্যে খুব সামান্য পার্থক্যই দেখতে পাব। কিন্তু, আমরা যদি সময়ের রাস্তা ধরে আরও অগ্রসর হতে থাকি, তাহলে দেখতে পাব এই সব পার্থক্যের মধ্যেকার ফাঁকটা ক্রমেই বড় হতে বড় হয়ে চলেছে। এবং শেষে এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যেটাকে আর পূরণ করাই সম্ভব নয় এবং এটা হয়েছে এই কারণে যে, মানুষ

তার প্রয়োজন মাফিক তার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করেছে। অন্যান্য ধর্মের ইতিহাসের প্রতি তাকালেও একই অবস্থা লক্ষ্য করা যাবে এবং এ বিষয়ে আমরা কুরআনের পূর্ণ সমর্থন পাই যে, ঐশীবাণীসমূহ মানুষের দ্বারা পরিবর্তন হয়েছে, সংযোজন হয়েছে, এক খোদার উপাসনা থেকে বহু খোদার উপাসনা সৃষ্টি হয়েছে, সত্য ঘটনা থেকে কল্পিত কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে; মানুষকে মানুষের আসন থেকে উন্নীত করে দেবতায় রূপান্তরিত করা হয়েছে।

কুরআন আমাদের বলে যে, একটি সত্য ধর্মকে চিহ্নিত করবার সুনিশ্চিত পন্থা হচ্ছে - সেই ধর্মের পরবর্তী পরিবর্তন ও ক্ষতি বা হানি সত্ত্বেও তার মূল বা উৎস পরীক্ষা করে দেখা। যদি দেখা যায় যে, সেই মূল খোদার একত্বের শিক্ষাই উদ্ঘাটিত করে, এক খোদার উপাসনার কথাই উদ্ঘাটিত করে এবং সমগ্র মানবতার প্রতি খাঁটি ও আন্তরিক সহানুভূতির কথাই উদ্ঘাটিত করে, তাহলে সেই ধর্মকে পরবর্তী পরিবর্তন সত্ত্বেও, অবশ্যই সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে। এই মানদন্ডে যে সকল ধর্ম উৎরে যাবে সেই সকল ধর্মের প্রবর্তকগণকে নিঃসন্দেহে ধরে নিতে হবে যে, তারা খোদাভীরু ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন খোদার মনোনীত সত্য রসূল। এবং আমাদের উচিত হবে, তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি না করা, এবং তাদের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। সময়ের ও স্থানের তফাৎ থাকা সত্ত্বেও, এমন অনেক মৌলিক বিষয় আছে যেগুলো সকলের ক্ষেত্রেই অভিন্ন। এজন্যই কুরআন করীমে বলা আছে ঃ

وَمَآ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۙ حُنَفَآءَ وَ
يُقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

'এবং তাহাদিগকে ইহা ব্যতিরেকে আদেশ দেওয়া হয় নাই যে, তাহারা কেবল আল্লাহ্‌রই ইবাদত করিবে ধর্মকে তাঁহারই জন্য বিশুদ্ধ করিয়া একনিষ্ঠভাবে, এবং নামায কায়েম করিবে এবং যাকাত দিবে এবং ইহাই (সত্যের উপর) প্রতিষ্ঠিত চিরস্থায়ী ধর্ম'-(সূরা আল্‌ বাইয়্যেনাহ্‌ 98:6)

একটি চিরন্তন ধর্ম

ইসলামের আর একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ইসলাম শুধু তার সার্বজনীন চরিত্রেরই দাবী করে না, বরং এই দাবীও করে যে, ইহা চিরন্তন। এবং সে তার এই সব দাবী পূরণের পূর্বশর্তগুলি পূরণ করতেও তৎপর। যেমন, কোন একটি বাণী বা পয়গাম তখনই চিরন্তন হতে পারে, যখন তা প্রতিটি ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ ও যথার্থ বলে পরিগণিত হয়, এবং তার মধ্যে নিহিত আধেয় বিষয়াবলী সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেয়। অন্যকথায়, সেই সব বাণীর বা ধর্মের অবতীর্ণ গ্রন্থগুলিতে এই ঐশী নিশ্চয়তা থাকতে হবে যে, সেগুলি মানুষের দ্বারা পরিবর্তিত হবে না, প্রক্ষেপিত হবে না। কুরআনের শিক্ষার ব্যাপারে আমরা বলতে পারি যে,- সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তাআলা কুরআনের মধ্যেই দাবী করেছেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ
وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে (অনুগ্রহকে) সম্পূর্ণ

করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন রূপে মনোনীত করিলাম।' (সূরা আল্ মায়েদা 5:4)

কুরআনের হেফাযত

আমি বলেছি যে, কোন শিক্ষার পথে চিরন্তন হওয়ার জন্য শুধুমাত্র এটুকুই যথেষ্ট নয় যে, তা কেবল সম্পূর্ণ ও যথার্থ হবে, বরং সেই সঙ্গে এই নিশ্চয়তাও থাকতে হবে যে, তার মূলরূপ চিরস্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকবে। কুরআন এই মৌলিক ও অপরিহার্য শর্তটি যথার্থরূপেই পূরণ করে। এবং সেই এক খোদা যিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ ○

'নিশ্চয় আমরাই নাযেল করিয়াছি এই গ্রন্থ (কুরআন) এবং নিশ্চয় আমরাই ইহার হেফাযতকারী' (সূরা আল্ হিজর 15:10)।

মোদ্দা কথা, আল্লাহ্ স্বয়ং এই গ্রন্থের হেফাযত করবেন, এবং কোনক্রমেই এর মধ্যে কোন পরিবর্তন হতে দেবেন না! কুরআনের পাঠ বা 'টেক্সট' এর সংরক্ষণ করার একটা পদ্ধতি হচ্ছে,- আল্লাহ্র ইচ্ছায়, প্রতিটি যুগে এমন লক্ষ লক্ষ লোক ছিলেন যাঁরা সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্ত করে রেখেছিলেন, এবং এই ধারাটি অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, এর বাণীর প্রকৃত তত্ত্ব ও তাৎপর্য সংরক্ষণের প্রধান পদ্ধতি হচ্ছে, - প্রতি শতাব্দীতে ইমাম ও সংস্কারক মনোনীত করার প্রক্রিয়া। সেই সঙ্গে, শেষ যুগে একজন মহান সংস্কারকারী ও পুনর্জীবিতকারীর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী, যিনি স্বয়ং সর্বশক্তিমান

আল্লাহ্ কর্তৃক আধ্যাত্মিক নেতারূপে নিয়োজিত হবেন এবং যিনি ঐশী নির্দেশনা ও পরিচালনার অধীনে থেকে ইসলামের অনুসারীদের মধ্যকার বিভিন্ন পার্থক্য ও মতবৈষম্যের নিরসন করবেন, ফলে সংরক্ষিত থাকবে কুরআনের প্রকৃত মর্ম। অবশ্য একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, কুরআন সংরক্ষণের এই যে দাবী তা নির্ভরযোগ্য দলীল প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত কি না। এই প্রশ্নটির উত্তরের একটা সূত্র এই সত্যের মধ্যে নিহিত যে, এমন বহুসংখ্যক অমুসলিম গবেষক আছেন, যাঁরা তাঁদের প্রচন্ড বিদ্বেষ সত্ত্বেও প্রমাণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন যে, কুরআনের পাঠে (টেক্সটে) কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে, কিংবা সামান্য কোন কমবেশী করা হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, এমন অনেক অমুসলিম গবেষক আছেন, যাঁরা তাঁদের পুংখানুপুংখ ও বিস্তারিত গবেষণার পর প্রকাশ্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, কুরআন ঠিক ঠিক তার মূলরূপেই অক্ষুন্ন রয়েছে, নিরাপদে রয়েছে এবং হেফাযতে রয়েছে। যেমন স্যার উইলিয়াম মুইর তাঁর 'লাইফ অফ মুহাম্মদ' পুস্তকে লিখেছেন ঃ

'We may, upon the strongest presumption, affirm that every verse is the genuine and unaltered composition of Muhammad himself.', (Muir: Life of Muhammad, P. XXVIII)

'আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বিনা বিচারেই মেনে নিতে পারি যে, প্রতিটি শ্লোকই মুহাম্মদের নিজের মূল ও অপরিবর্তিত রচনা।'--(পৃঃ 28)

মুইর আরও বলেছেন ঃ

There is otherwise every security, internal and external, that we possess the text which Muhammad himself gave forth and used.'(Muir: Life of Muhammad, P. XXVII).

'যে টেক্সট (কুরআনের) আমরা পেয়েছি, যা মুহাম্মদ নিজেই দিয়েছেন এবং ব্যবহার করেছেন, তার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রত্যেক প্রকারের নিরাপত্তা রয়েছে।' --(ঐ, পৃঃ 27)।

নলডিকি (Noldeke) বলেছেন ঃ

Slight clerical errors there may have been, but the Holy Quran of Uthman contains none but genuine elements, though sometimes in very strange order. The efforts of European scholars to prove the existence of later interpolations in the Holy Quran have failed. (Enc. Brit. 9th Edition under the word: The Holy Quran)

'সামান্য করণিক (clerical) বিচ্যুতি হয়তো থাকতে পারতো, কিন্তু, ওসমানের (সংগ্রন্থিত) কুরআনে মূল ছাড়া অন্য আর কিছুই নেই, যদিও তা অনেক সময় অস্বাভাবিক পদ্ধতিতেও বিন্যস্ত করা হয়েছে। কুরআনের মধ্যে পরবর্তী কোন প্রক্ষেপের অস্তিত্ব আবিস্কারের লক্ষ্যে ইউরোপীয় গবেষকদেরও তাবৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।'

-(দ্রঃ-এনসাই, ব্রিটানিকা ঃ 'কুরআন' শীর্ষক প্রবন্ধ)।

একটি সম্পূর্ণ ধর্ম

পবিত্র কুরআনের শিক্ষা সম্পূর্ণ এবং সর্বোত্তম, এবং তা সর্বযুগেই মানবজাতির পথ-নির্দেশ বা হেদায়াত দান করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। ইসলামের এই দাবী স্বতন্ত্র ও অনন্য সাধারণ, এবং তা যথার্থ রূপেই যুক্তি দ্বারা সমর্থিত। এই স্বল্প সময়ে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমি তাই, এ ব্যাপারে কিছু কিছু সহায়ক নীতি ও বিশদ দৃষ্টান্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে চাই। প্রথমত: আমাদেরকে বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, ইসলাম কিভাবে পরিবর্তনশীল সময়ের চাহিদাসমূহ মেটাতে সক্ষম- যার জন্য পূর্ব থেকেই সে তার শিক্ষার মধ্যে সম্ভাব্য পরিবর্তনের উপযোগী বিষয়াদি সন্নিবেশিত করে রেখেছে। এক্ষেত্রে, ইসলামের বাস্তব নির্দেশনা নিয়ে গবেষণা করার কাজটা সত্যিই আকর্ষণীয় ও উৎসাহব্যঞ্জক। এ সম্পর্কে আমি একটা নমুনা মাত্র পেশ করবো আপনাদের সামনে ঃ

1. ইসলাম শুধু মৌলিক নীতিমালাই নির্ধারণ করে, এবং এগুলির এমন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা থেকে বিরত থাকে যার প্রয়োজন দেখা দেয় সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে।

2. ইসলাম মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের প্রতি পুরোপুরি খেয়াল রাখে এবং সম্ভাব্য সকল পরিস্থিতি মোতাবেক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখে। ইসলাম শুধু এটাই স্বীকার করে না যে, জাতিসমূহের মধ্যে ক্রমাগতভাবে পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে, বরং সে এই বাস্তবতাও স্বীকার করে যে, সকল জাতি তাদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে একই সময়ে সমান তালে চলতে পারে

না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়,- পৃথিবীর কোন অংশে হয়তবা এখনও প্রস্তরযুগের মানুষেরা বসবাস করছে; এখনও হয়ত এমন কোন গোষ্ঠী বা গোত্র আছে, যারা আমাদের যুগ থেকে হাজার বছর পিছনে পড়ে আছে, যদিও আমরা এবং তারা একই সময়কালের মানুষ। তবু, তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বস্তুতঃ, এমন এক যুগে অবস্থিত, যা এখনও বহু যুগ পিছনেই পড়ে আছে। একটা ব্যাপারে আমরা সবাই একমত হব বলে আমি নিশ্চিত যে, অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের উপরে অথবা কঙ্গোর পিগ্‌মীদের উপরে আধুনিক রাষ্ট্রনীতির আদর্শগুলোকে চাপিয়ে দেওয়াটা নিতান্তই বোকামীর কাজ হবে।

3. ইসলাম এমন এক ধর্ম, যা মানব প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খায় এবং মানবিক যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করে। এর কোন শিক্ষারই পরিবর্তন আবশ্যক হয় না, যদি না মানব-প্রকৃতিতে কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়- যে বিষয়টার সম্ভাবনা আমরা সরাসরি নাকচ করে দিতে পারি।

এই বিষয়গুলো হচ্ছে ইসলামী শিক্ষার কয়েকটি দিক মাত্র। আমি এখন, এগুলো সম্পর্কে আরও কিছুটা আলোচনা করতে চাই, যাতে করে আমার বক্তব্য আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে সুবিধা হয়।

যাকাত বনাম সুদ

ইসলাম সর্ব প্রকারের সুদকেই হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এবং এর সম্পূর্ণ উৎসাদন চায় কঠোরভাবে। সুদের স্থলে যে

চালিকা শক্তি–অর্থনৈতিক চক্রকে চালু রাখবার যে শক্তি–ইসলাম পেশ করে, তারই নাম 'যাকাত'। বলাই বাহুল্য, এই স্বল্প সময়ের মধ্যে, এই বিষয়টি নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করতে পারব না। সুতরাং এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কুরআনী শিক্ষার সারমর্ম উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে কুরআন যে নিয়মপ্রণালী গ্রহণ করেছে, কেবল তার উপরেই কিছু কথা আমি বলতে চাই।

যাকাত হচ্ছে, পুঁজির উপরে কর ধার্য করার একটা পদ্ধতি, যা আদায় করা হয় বিত্তশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে। রাষ্ট্রের দাবী পূরণ করা ছাড়াও এই কর দ্বারা গরীবদের প্রয়োজনও মেটানো হয়। অন্য কথায়, এই পদ্ধতি কেবল সরকার বা রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রয়োজনই মেটায় না, বরং সেই সঙ্গে সমাজ কল্যাণের দাবীগুলিও মেটায়। এতে শুধু মূলনীতিই দেওয়া আছে, বাকী সবকিছুই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সময় ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অন্তর্দৃষ্টি ও বিচার বিবেচনা দ্বারা নির্ধারণের উপরে। কুরআন বলে যে, যাদের মৌলিক প্রয়োজনাদি পূরণের অতিরিক্ত সম্পদ আছে, তাদের সম্পদের মধ্যে অংশ আছে সেই সকল লোকদেরও, যাদের মৌলিক চাহিদাবলী পূরণের মত পর্যাপ্ত সম্পদ নেই, বা যারা পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে বঞ্চিত। এতে স্পষ্টরূপে এটাই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, প্রতিটি মানুষ, তা সে যে কোন দেশের বা সমাজের বাসিন্দা হোক না কেন, তার জীবন যাপনের মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার অধিকার আছে। এবং তার এই মৌলিক অধিকার পূরণের দায়িত্ব তাদেরই উপরে বর্তায় যাদের মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ রয়েছে। তবে, এর কার্যপ্রণালী কি হবে, তা নির্ধারণ করবে রাষ্ট্র। যার মধ্যে এই নিশ্চয়তাও থাকতে

হবে যে, সেই পদ্ধতি হবে অবাধ, সঠিক, সুষম এবং মূল উদ্দেশ্য সাধনে পর্যাপ্ত।

রাজনৈতিক নির্দেশাবলী

অপর যে আন্তর্জাতিক প্রশ্নটির আজকের দিনে আমাদেরকে মোকাবেলা করতে হয়, তা হলো- একটা অঞ্চলের বা দেশের সরকার পদ্ধতির রূপ কি হবে তা নিরূপণ করা। এই ক্ষেত্রেও ইসলামের নির্দেশক নীতিমালা এত যথাযথ, সুবিবেচিত ও স্থিতিস্থাপক যে, সেগুলোর সঠিকত্ব ও কার্যকারিতা একটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, একটা বিশেষ পদ্ধতির সরকার/ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কেবল তখনই উপযোগী কিংবা অনুপযোগী বলে বিবেচিত হবে, যখন তা প্রবর্তিত হবে বিশেষ বিরাজমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এবং এটা কল্পনা করা বাতুলতা যে, একটা নির্দিষ্ট ধরণের রাজনৈতিক পদ্ধতি সর্ব যুগে সর্ব জাতির প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। এবং এ কারণেই, ইসলাম বিশেষ কোন একটা পদ্ধতির সরকারের কথা নির্দিষ্ট করে বলে দেয় না। ইসলাম না গণতান্ত্রিক অথবা সমাজতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতিকে নির্দিষ্ট করে, না রাজতন্ত্র অথবা একনায়কত্বের সুপারিশ করে। সরকার প্রতিষ্ঠার পদ্ধতির ব্যাপারে বিশেষভাবে বলার পরিবর্তে ইসলাম রাজনৈতিক ও সরকারী বিষয়াদি পরিচালনার নীতি নির্ধারণ করে সুনির্দিষ্টভাবে; এবং শর্ত আরোপ করে যে, সরকার পদ্ধতি যাই হোক না কেন, সরকারের দায়িত্বাবলী সম্পাদন করতে হবে ইনসাফের সাথে এবং ন্যায্যভাবে সহানুভূতি সহকারে এবং মৌলিক অধিকারসমূহ অক্ষুন্ন

রাখতে হবে সব সময়ে। অতএব, সাধারণভাবে গৃহীত গণতন্ত্রের সংজ্ঞার প্রথম যে অংশটি অর্থাৎ 'জনগণ কর্তৃক গঠিত সরকার' (Government by the people) এর উপরে জোর দেওয়ার পরিবর্তে, ইসলাম সর্বক্ষেত্রেই জোর দেয়- তা সে সরকার পদ্ধতি যা-ই হোক না কেন- 'জনগণের জন্য সরকার' (Government for the people) এর উপর। সুতরাং সব ধরণের সরকার পদ্ধতির মধ্যে যখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কথা বলা হয়, তখন তার গুণগত দিকটার প্রতিই বেশী জোর দেওয়া হয় এই জন্য যে, এটা যেন কোন ফাঁপা গণতন্ত্র না হয়। কিন্তু, যারা নিজেদের শাসকবর্গকে নির্বাচিত করবে তাদেরকেও যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। সম্পূর্ণরূপে সাধুতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এমন লোকদেরকে নির্বাচিত করতে হবে, যারা সত্যি সত্যিই তাদের পদের জন্য সুযোগ্য এবং সুদক্ষ। যে কোন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচনের জন্য এটাই হচ্ছে কুরআন প্রবর্তিত পূর্ব শর্ত। কুরআনের কথায়-

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰٓى أَهْلِهَا ۙ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۚ ...

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ দিতেছেন যে, তোমরা আমানতসমূহকে উহাদের প্রাপককে অর্পণ কর, এবং যখন তোমরা লোকের মধ্যে বিচার কর তখন ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার কর।"- (সূরা আন্ নিসা 4:59)।

সুতরাং, যে কোন পদ্ধতির সরকারই গঠিত হোক না কেন, তা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রেই ন্যায়বিচারের মাধ্যমে

শাসনকার্য পরিচালনা করতে বাধ্য থাকবে।

এক্ষণে আমি সরকারের জন্য - তা সে যে কোন পদ্ধতির হোক না কেন - কুরআন প্রদত্ত মৌলিক নীতিমালা থেকে যে সব নিয়ম বা বিধি প্রণয়ন করা যেতে পারে তা সংক্ষেপে পেশ করতে চাই ঃ

1. সরকার দেশের জনগণের সম্মান, জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানে বাধ্য থাকবে। - (দ্রঃ 4:59)

2. শাসককে অবশ্যই মানুষে মানুষে কিংবা গোত্রে গোত্রে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে আচরণ করতে হবে।- (দ্রঃ- 4:59)

3. জাতীয় সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি করতে হবে আলোচনার মাধ্যমে। (দ্রঃ 42:39)

4. সরকারকে জনগণের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করতে হবে। অর্থাৎ জনগণের খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের সুবন্দোবস্ত করতে হবে। (দ্রঃ 20: 119-120)

5. জনগণের জন্য শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে, এবং জীবন, সম্পদ ও সম্মানের হেফাযত করতে হবে। (দ্রঃ 2:206)

6. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুষম, নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল করতে হবে। (দ্রঃ 16:91)

7. স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা সুসংগঠিত করতে হবে। (দ্রঃ 6:143)

8. সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দিতে হবে। (দ্রঃ 2:257)

9. পরাজিত জাতির প্রতি ন্যায়-বিচারের সহিত আচরণ করতে

হবে। (দ্রঃ 5:9)

10. যুদ্ধবন্দীদের প্রতি অনুকম্পার সহিত আচরণ করতে হবে। (দ্রঃ 8ঃ68)

11. সন্ধি ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। (দ্রঃ 16:92)

12. দুর্বলের উপরে জোর করে অসম চুক্তি চাপানো যাবে না। (দ্রঃ 16:93)

13. মুসলিম প্রজাদেরকে বৈধ সরকারের প্রতি অনুগত থাকতে হবে। এই অবস্থার ব্যতিক্রম কেবল তখনই হতে পারবে, যখন সরকার প্রকাশ্যে নির্লজ্জভাবে ধর্মীয় কাজকর্মে বা দায়িত্বাবলী পালনে বাধা দেবে এবং বিরোধিতা করবে। (দ্রঃ 4:60)

14. শাসকের সঙ্গে যদি মতপার্থক্য দেখা দেয়, তবে তা নিষ্পত্তি করতে হবে কুরআন প্রদত্ত ও রসূলে পাক (সা.) প্রবর্তিত নীতিমালার আলোকে। কোন অবস্থাতেই কেউ স্বার্থপরতার বশবর্তী হতে পারবে না। (দ্রঃ 4:60)

15. সাধারণ উন্নয়নমূলক এবং জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনগণকে কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা করতে হবে। অসহযোগিতার তথাকথিত আন্দোলন নিষিদ্ধ। (দ্রঃ 5:3)।

16. অনুরূপভাবে, সরকারকেও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উদ্যোগে গৃহীত কল্যাণমূলক পরিকল্পনায় সহযোগিতা করতে হবে এবং অনুরূপ কোন প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করা চলবে না।

17. কোন শক্তিশালী দেশ অপর কোন দেশের বিরুদ্ধে কোনক্রমেই কোন আগ্রাসন চালাতে পারবে না। অস্ত্রধারণ কেবল

আত্মরক্ষার ক্ষেত্রেই অনুমোদিত। - (দ্রঃ- 20:132)

ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের ইসলামী ধারণা

আমি এখন ইসলামী নীতিমালার মধ্য থেকে এমন কতকগুলো দৃষ্টান্ত পেশ করবো যেগুলির প্রয়োজনীয়তা আজকের দুনিয়ায় সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী শিক্ষা প্রথম যে বিষয়টির উপরে গুরুত্ব দেয়, তা হচ্ছে- ইনসাফ ও ন্যায়বিচার। অন্যান্য ধর্মগুলি ইনসাফ ও ন্যায়বিচারভিত্তিক প্রশাসন সম্পর্কে কোন সামগ্রিক নির্দেশনা দান করে না। যদি সেগুলো এ সম্পর্কে কিছু বলে, তা এমনভাবে বলে, যা কিনা আজকের দিনে আমাদের বেলায় সামান্যই প্রযোজ্য হতে পারে। বস্তুতঃ, এই নির্দেশনায় কোন কোন অংশ এমন যে তা আমাদের এই যুগের বুদ্ধিবৃত্তি ও আবেগ অনুভূতির সরাসরি পরিপন্থী। ফলে, যে কেউ একথা বলতে পারবে যে, এগুলো বিকৃত হয়ে গেছে, কিংবা এগুলোর কার্যকারিতা ছিল স্থানীয় ও সাময়িক। যেমন, ইহুদী ধর্ম এমন এক খোদার কথা পেশ করে যিনি কেবলমাত্র ইসরাঈলীদেরই খোদা, বাকী মানবজাতির খোদা নন। কাজেই, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, এই ধর্মটি মানবাধিকার সম্পর্কিত মৌলিক প্রশ্নটির ব্যাপারে কোন কথাই বলে না, এমনকি, প্রসঙ্গক্রমেও না।

হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বলতে হয় যে, এই ধর্ম যে কেবল অহিন্দুদের প্রতিই সরাসরি বৈরীভাবাপন্ন তা নয়, বরং তা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রতিও বৈরীভাবাপন্ন। ফলে, এই ধর্ম খোদার রহমতকে সংকীর্ণ করে নিয়ে মানবজাতির মাত্র একটা ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। হিন্দু ধর্মের একটা রায় হচ্ছে,- “যদি কোন ব্রাহ্মণ

নিম্নবর্ণের কোন লোকের ঋণ পরিশোধ করতে না পারে, তাহলে নিম্নবর্ণের লোকটির কোন অধিকার থাকবে না সেই ঋণের উপরে তার দাবী রাখার। পক্ষান্তরে, নিম্নবর্ণের কোন লোক যদি কোন ব্রাহ্মণের ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে শ্রমিক হিসেবে সেই ব্রাহ্মণের কাজ করে দিতে হবে ততদিন, যতদিন না তার সেই ঋণ পুরোপুরি পরিশোধ হয়।”- (মনু স্মৃতি- 10:35)।

আবারও একবার আমি দৃষ্টি দিতে চাই ইহুদী ধর্মের প্রতি। এই ধর্মটিতে শত্রুর প্রতি ন্যায়বিচারের কোন ধারণাই নেই। বরং বলা হয়েছেঃ ‘যখন তোমাদের প্রভু তোমাদের খোদা, তাদেরকে তোমাদের হাতে ছেড়ে দেয়, তখন তোমরা তাদেরকে পরাস্ত কর, তখন তাদেরকে নিঃশেষে ধ্বংস করে দাও, এবং তাদের সঙ্গে কোন সন্ধি-চুক্তি করো না।’ (দ্বিঃ বিবরণ 7:2)

আমি এখন এক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে প্রযোজ্য ইসলামী শিক্ষার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই। কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে ঃ

1. এবং যখন তোমরা লোকের মধ্যে বিচার কর তখন ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার কর। - (4:59)।

2. ন্যায়পরায়ণতার উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষী হিসাবে, যদিও (তোমাদের সাক্ষ্য) তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতার বা স্বজনগণের বিরুদ্ধেও যায়। - (4:136)।

3. এবং কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে আদৌ এই অপরাধ করিতে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার না কর। তোমরা সুবিচার কর, ইহা তাক্‌ওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। - (5:9)

4. এবং আল্লাহ্‌র পথে তোমরা ঐ সকল লোকের সহিত যুদ্ধ কর যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু তোমরা সীমালঙ্ঘন করিও না, নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না। -(2:191)

5. 'এবং যদি তাহারা শান্তির দিকে ঝুঁকে তাহা হইলে তুমিও ইহার দিকে ঝুঁকিবে এবং তুমি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিবে। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।' - (8:62)

আমি আর একটা উদাহরণ দিতে চাই ইসলামের চিরন্তন শিক্ষা থেকে- প্রতিশোধ ও ক্ষমাশীলতার ব্যাপারে। এ সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে যখন আমরা অন্যান্য ধর্মের শিক্ষার তুলনা করতে যাই, তখন সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে পড়ে তৌরাত বা পুরাতন নিয়মের (বাইবেল) একটা নির্দেশ ঃ

'তোমাদের চক্ষু করুণা করবে না; প্রাণের বদলা প্রাণ, চোখের বদলা চোখ, দাঁতের বদলা দাঁত, হাতের বদলা হাত, পায়ের বদলা পা।'- (যাত্রা- 21:24)

সন্দেহ নেই যে, প্রতিশোধ গ্রহণের উপর এত বেশী জোর দেওয়াটা কেবল বিস্ময়েরই উদ্রেক করে না, আমাদের হৃদয়কে ভারাক্রান্তও করে তুলে। এই উদাহরণটা তুলে ধরার উদ্দেশ্য এ নয় যে, আমি অন্য ধর্মের নিন্দা করছি; বরং আমি এটাই দেখাতে চাই যে, কুরআনী নীতির আলোকে দেখলেও দেখা যাবে- কোন কোন ক্ষেত্রে অনুরূপ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণেরও প্রয়োজন পড়ে। সুতরাং পবিত্র কুরআন আমাদেরকে অন্যান্য ধর্মের বিরোধপূর্ণ নীতির

অনুসরণেও সাহায্য করে, - তবে তা করে সহানুভূতি ও সঠিক উপলব্ধির মনোভাব নিয়ে। এবং এই ব্যাপারটিও ইসলামের একটি ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য। কুরআন অনুসারে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশোধও নেওয়া যাবে বিশেষ সময়ে, বিশেষ প্রয়োজনে। ইসরাঈলীদের জন্য এই ধরণের প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তাদের জন্য তাদের হৃদয়ে সাহস সঞ্চারের উদ্দেশ্যে। কেননা, তারা দীর্ঘকাল ধরে পরাভূত ও বন্দী অবস্থায় থাকার দরুণ ভীরু হয়ে পড়েছিল এবং নিজেদেরকে ছোট জাত মনে করার একটা হীনমন্যতাবোধ গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে। কাজেই, সেমতাবস্থায় ক্ষমার উপরে জোর দেওয়াটা সমীচীন হতো না। কারণ তাতে ইসরাঈলীদেরকে তাদের জলাভূমিতে আরও গভীরে তলিয়ে দেওয়া হতো। এবং তাদেরকে তাদের শোচনীয় দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙ্গার সৎসাহস ও আত্মবিশ্বাস দান করা হতো না। সুতরাং, এই শিক্ষা ছিল তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষাপটে সঠিক ও যথার্থ, এবং তা দান করেছিলেন সর্বজ্ঞ খোদা তাআলাই।

অপরদিকে, আমরা যখন 'নতুন নিয়ম' (নিউ টেষ্টামেন্ট) এর প্রতি তাকাই, তখন দেখি, তার শিক্ষা ক্ষমার ব্যাপারে এত বেশী জোর দেয় যে, তা ইসরাঈলীদেরকে সর্বপ্রকার প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করে রাখে। এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে, - বহুকাল যাবৎ পূর্ববর্তী শিক্ষার অনুসরণ করে চলার দরুণ ইসরাঈলীরা কঠিন হৃদয় ও হিংস্র হয়ে উঠেছিল, এবং তাদের এই অবস্থার সংশোধনের জন্য প্রয়োজন ছিল তাদের প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকারকে কিছু দিনের জন্য হলেও মূলতবী করে দেওয়া। এ

কারণেই মসীহ্ (আ.) তাদেরকে নসীহত করেছেন এই বলে ঃ

"তোমরা শুনেছ যে, বলা আছে ঃ এক চক্ষুর বদলায় এক চক্ষু, এক দাঁতের বদলায় এক দাঁত; কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলছি যে, যে মন্দ তাকে বাধা দিও না। বরং কেউ যদি তোমার ডান গালে চড় মারে, তার দিকে তুমি অপরটিও পেতে দাও; এবং কেউ যদি তোমার প্রতি অসদাচরণ করে এবং তোমার কোট নিয়ে যায়, তাকে তোমার আলখেল্লাও দিয়ে দাও।" (মথি-5:35-45)

ইসলাম এই উভয় বিপরীতমুখী শিক্ষাকে পরস্পর সম্পূরক হিসেবে গণ্য করে; এর প্রত্যেকটা ছিল বিরাজমান অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যথাযথ। সুতরাং এর কোনটাই সার্বজনীন বা চিরন্তন হওয়ার দাবী করতে পারে না। এবং এটাই আসলে যুক্তিরও কথা। কেননা, মানুষ তখনও মাত্র প্রাথমিক উন্নতির স্তরগুলো অতিক্রম করে প্রগতির পথে অগ্রসর হচ্ছিল এবং তখনও পর্যন্ত এমন কোন একক সভ্য অবস্থার সৃষ্টি হতে পারেনি, যে অবস্থায় একটা চূড়ান্ত বা সার্বজনীন বিধান বা ব্যবস্থা দান করা যেত। আমরা বিশ্বাস করি যে, ইসলামই হচ্ছে সেই চূড়ান্ত বিধান বা শরীয়ত। এবং তা এমন এক শিক্ষাদান করে, যা স্থান ও কালের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয় না। এবং এই বিষয়টির বিবেচনার ক্ষেত্রেও ইসলামের শিক্ষায় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন বলে ঃ

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ
اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ○

অর্থ- 'এবং (স্মরণ রেখো যে,) মন্দের প্রতিফল তার অনুরূপ মন্দ, এবং যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং সংশোধন করে তার পুরস্কার

আল্লাহ্‌র জিম্মায়। আল্লাহ্ যালেমদেরকে ভালবাসেন না।' (আশ্ শূরা 42:41)।

ইসলাম তাই পূর্ববর্তী উভয় শিক্ষার সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যগুলোকে একত্রে সমন্বিত করেছে, এবং তার সঙ্গে এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিও যোগ করেছে যে, ক্ষমাই প্রশংসনীয়, যদি তার দ্বারা দোষী ব্যক্তির সংশোধন হয়, উন্নতি হয়; এবং এটাই আসলে মূল লক্ষ্য। নইলে শাস্তিদান করাই বিধেয়। তবে তা অপরাধীর অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী হতে হবে, মাত্রাতিরিক্ত হতে পারবে না। এই নির্দেশনা নিঃসন্দেহে মানব প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং উপযোগীও। এবং এই শিক্ষার কার্যকারিতা আজও ঠিক তেমনি আছে, যেমনটি ছিল এর অবতীর্ণ হওয়ার যুগে চৌদ্দ শ' বছর পূর্বে।

আরও কিছু বৈশিষ্ট্য

ইসলামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিষয়টি অনেক বিস্তৃত। এখানে আমি মাত্র গুটি কয়েক বৈশিষ্ট্যের উপরেই আলোকপাত করেছি, যেগুলিকে আমি চয়ণ করে নিয়েছিলাম আমার এই আলোচনার জন্যে। অন্য যে বৈশিষ্ট্যগুলির কথা আমি বাদ দিতে চাই না, সেগুলি সম্পর্কে সময়ের স্বল্পতার দরুণ শুধু প্রাসঙ্গিক ভাবে কিছু কথা আমি বলবো ঃ

1. ইসলাম বলে যে, আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা এবং অত্যন্ত শাণিত ও সরল ভাষায় ব্যক্ত করে তাঁর একত্ব বা তৌহিদ যা গ্রাম্য ও বুদ্ধিজীবি উভয় শ্রেণীর মানুষের কাছে সহজেই বোধগম্য। ইসলামের খোদা এক পূর্ণ-সত্তা, যিনি সকল গুণাবলীর উৎস এবং

সকল দোষ-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি এক জীবন্ত খোদা, তিনি যিনি সর্বত্রই নিজেকে প্রকাশিত করেন। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসেন এবং তাদের প্রার্থনা শোনেন। তাঁর কোন গুণই রহিত বা মুলতবী হয়ে যায়নি। সুতরাং তিনি পূর্বের মতই মানবজাতির সঙ্গে যোগ-সংযোগ রক্ষা করেন। এবং তাঁর সান্নিধ্যে পৌঁছাবার পথ সমূহকেও তিনি বন্ধ করে দেননি।

2. ইসলাম বলে যে, খোদার কথায় ও কাজে কোন বিরোধ নেই। অতএব, বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে চিরপ্রচলিত যে বিরোধ, তা থেকে ইসলাম আমাদেরকে মুক্ত করে এবং ইসলাম মানুষকে এমন কিছুতে বিশ্বাস করতে প্ররোচিত করে না যা খোদার নির্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়ম বহির্ভূত। তিনি আমাদের প্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করতে এবং তা মানুষের কল্যাণার্থে নিয়োজিত করতে উদ্বুদ্ধ করেন। কেননা সবকিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষেরই কল্যাণার্থে।

3. ইসলাম কোন প্রকার ফাঁকা দাবী করে না। এবং যা আমরা বুঝি না তা বিশ্বাস করতেও আমাদেরকে বাধ্য করে না। ইসলাম তার শিক্ষার সমর্থনে যুক্তি পেশ করে, ব্যাখ্যা দান করে, যাতে আমাদের বুদ্ধিমত্তা এবং আমাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়।

4. ইসলাম কোন পৌরাণিক কাহিনী বা লোক-কাহিনীর উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। ইসলাম প্রত্যেককেই আহ্বান জানায় এর সত্যকে স্বয়ং পরখ করে দেখবার এবং তা এই বিশ্বাস রাখে যে, সত্য সব সময়ই কোন না কোন ভাবে যাচাই যোগ্য।

5. ইসলামের অবতীর্ণ গ্রন্থ এক কথায় অনন্য এবং অন্যান্য ধর্মের গ্রন্থাবলী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এর বিরুদ্ধবাদীরা শত শত

বৎসর ধরে সমবেত প্রচেষ্টা চালিয়েও এই বিস্ময়কর গ্রন্থটির একটি ক্ষুদ্র অংশেরও সমতুল্য কিছু পেশ করতে পারেনি। এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু এর অনবদ্য সাহিত্যিক উৎকর্ষতার মধ্যেই নিহিত নয়, বরং তা এর শিক্ষার সহজবোধ্যতা এবং ব্যপকতার মধ্যেও নিহিত। কুরআন দাবী করে যে, এর শিক্ষাই সর্বোত্তম, এবং এইরূপ দাবী অন্য আর কোন ধর্মগ্রন্থের নেই।

6. কুরআন দাবী করে যে, সে পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর উত্তম বৈশিষ্ট্যগুলোর সমন্বয় সাধন করেছে, এবং সমস্ত স্থায়ী ও বোধগম্য শিক্ষাকে স্বীয় পরিধির মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছে। কুরআন বলে:

'এখানেই আছে চিরন্তন আদেশাবলী।'(98:4)। এবং 'এই শিক্ষাই তো দান করা হয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে - ইব্রাহীম ও মূসার কিতাবে।' (87:19-20)।

7. ইসলামের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এর অবতীর্ণ গ্রন্থের ভাষা জীবন্ত। এটা কি একটা লক্ষণীয় বিষয় নয় যে, অন্যান্য সকল অবতীর্ণ গ্রন্থের ভাষা হয় মৃত, নয় তো এখন সেগুলোর আর সাধারণ ব্যবহার নেই? একটি জীবন্ত গ্রন্থ, সঙ্গত কারণেই একটি জীবন্ত ও চিরস্থায়ী ভাষাতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

8. ইসলামের আর একটি স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে - এর নবী (সা.) একটি দরিদ্র ও অনাথ শৈশব থেকে শুরু করে স্বজাতির একজন একচ্ছত্র রাষ্ট্রনায়ক হওয়া পর্যন্ত মানবীয় অভিজ্ঞতায় ধারণাযোগ্য প্রতিটি স্তর অতিক্রম করেছেন। তাঁর জীবন চরিত সবিস্তারে লিপিবদ্ধ আছে। যে জীবনচরিত থেকে প্রতিভাত হয় আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর অতুল ঈমান এবং খোদার পথে তাঁর প্রতি মুহূর্তের আত্মত্যাগ। তাঁর জীবন ছিল

একটি সম্পূর্ণ ও ঘটনাবহুল জীবন যা কর্মময়তায় ভরপুর। এবং তা মানব জীবনের সংগ্রামের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্যই আদর্শ চরিত্রের দৃষ্টান্ত রেখে গেছে। এটাই ছিল সঙ্গত এবং যথাযথ। কারণ তিনি ছিলেন কুরআন শরীফের জীবন্ত ভাষ্য বা তফসীর। এবং তাঁর ব্যক্তি জীবনের দৃষ্টান্তের দ্বারা তিনি অনাগত ভবিষ্যতের মানবজাতির চলার পথ আলোকিত করে গেছেন। এই ভূমিকা পূর্ণরূপে পালন অন্য আর কোন নবীর পক্ষেই সম্ভবপর হয়নি।

9. ইসলামের আর একটি স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে,- এর অগণিত ভবিষ্যদ্বাণী যুগের পর যুগ ধরে পূর্ণ হয়ে এসেছে। এবং সেগুলির পূর্ণতা সর্বজ্ঞ ও জীবন্ত খোদার অস্তিত্বের প্রতি এর অনুসারীদের ঈমান আরও বেশী তাজা ও অবিচল করেছে। এবং এই প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত রয়েছে। যেমন, যে ফেরাউন মূসা (আঃ) ও তাঁর জাতিকে মিশর থেকে বহিষ্কার করেছিল, সেই ফেরাউনের মমীকৃত লাশ অধুনা আবিষ্কৃত হয়েছে ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক। কুরআনের অন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে ধ্বংস সাধনের এক প্রকার প্রক্রিয়া আবিষ্কারের মাধ্যমে,- যে প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণার অভ্যন্তরে অগ্নি ধারণ বা আবদ্ধ করে রাখা হয়, যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে হতে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং ভয়ংকররূপে বিস্ফোরিত হয়ে পাহাড় পর্বতকে পর্যন্ত বাস্পীভূত করে শূন্যে মিলিয়ে দেয়।

10. ইসলামের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, যখন তা পরকাল ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের কথা বলে, তখন এই জগতের ভাবী ঘটনাবলী সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করে, যেগুলির পূর্ণতা মৃত্যুর

পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তার অনুসারীদের ঈমানকে আরো বেশী মজবুত করে।

11. ইসলাম ব্যষ্টি, গোষ্ঠী ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি সম্পর্কে ব্যাপকভিত্তিক ব্যবস্থা দান করেছে, যা অন্যান্য ধর্মে নেই। এই জাতীয় নির্দেশসমূহ সম্ভাব্য প্রত্যেকটি পরিস্থিতিতেই প্রযোজ্য - যেগুলি যুবক ও বৃদ্ধের সম্পর্ক, মালিক ও কর্মচারীর সম্পর্ক, পরিবারের লোকজন, বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের সম্পর্ক, এমনকি শত্রুর সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এতে যে নিয়ম-বিধি ও নীতিমালা দেওয়া আছে, তা সত্যিকার অর্থেই সার্বজনীন এবং তা কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

12. ইসলাম জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবজাতির জন্য সম্পূর্ণ সাম্যের ঘোষণা দেয়। আভিজাত্য ও মর্যাদার একমাত্র মানদন্ড যা ইসলাম নির্ধারণ করে তা হচ্ছে- ধর্মপরায়ণতা; এবং তা জন্ম, সম্পদ, জাত বা বর্ণের মানদন্ড নয়। কুরআন ঘোষণা করে ঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

অর্থ- 'নিশ্চয়, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক ধর্মপরায়ণ (মুত্তাকী)' (সূরা আল্ হুজরাত 49:14)। এবং আরো ঘোষণা করে ঃ

...وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

অর্থ- 'যে ব্যক্তি মোমেন হওয়া অবস্থায় সৎকর্ম করিবে, সে

পুরুষ হউক বা নারী, এমতাবস্থায় এই সকল লোক জান্নাতে প্রবেশ করিবে, সেখানে তাহাদিগকে বেহিসাব রিয্ক দেওয়া হবে।' (আল্ মো'মেন 40:41)

13. ইসলাম 'শুভ' এবং 'অশুভ' এর সংজ্ঞা নিরূপণ করে দিয়েছে, যা কিনা, অন্যান্য ধর্মের থেকে আলাদা। ইসলাম বিশ্বাস করে না যে, মানুষের স্বাভাবিক কামনা-বাসনা অশুভ, তাই নির্দেশ দেয় এগুলির যথাযথ প্রয়োগের। এগুলির বেঠিক প্রয়োগই অকল্যাণকর। ইসলাম আমাদের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে এবং সঠিক পথে প্রবাহিত করতে শেখায়, যাতে করে সেগুলি সমাজের জন্য গঠনমূলক ও কল্যাণকর হতে পারে।

14. ইসলাম নারীদেরকে শুধু সম্পত্তির উত্তরাধিকারই দান করে না, উপরন্তু পুরুষের সাথে তাদেরকে সমান অধিকারও দান করে। কিন্তু এমনভাবে নয়- যাতে করে তাদের দৈহিক গঠন স্বাতন্ত্রের ক্ষতি সাধিত হয় কিংবা তাদের সন্তান ধারণ ও লালনের দায়িত্ব বাধাগ্রস্ত হয়।

একটি শান্তির ধর্ম

পরিশেষে, আমি সকল শান্তি-অন্বেষণকারীদেরকে এই সুসংবাদ দিতে চাই যে, ইসলামই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম যা ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রে এবং সকল পর্যায়ে শান্তির গ্যারান্টি দান করে। ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যার নামেরও শাব্দিক অর্থ 'শান্তি', এবং যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে যায়, সে নিজেই

শুধু শান্তির আবাসে প্রবেশ করে না বরং সে অন্যদেরকেও শান্তির নিশ্চয়তা দান করে। এবং সে ঐ জাতীয় যাবতীয় কাজকর্ম পরিহার করে চলে, যার ফলে অসাম্য ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হতে পারে। হযরত রসূলে পাক (সা.) বলেছেন - সেই ব্যক্তিই মুসলমান যার কথায় ও কাজে অন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না - (বুখারী ঃ কিতাবুল ঈমান)। রসূলে পাক (সা.) তাঁর ওফাতের কিছু পূর্বে যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেছিলেন - যা 'বিদায় হজ্জের ভাষণ' নামে প্রসিদ্ধ - তা মানব জাতির জন্য শান্তির একটি চিরন্তন সনদ। ইসলাম শুধু মানুষে মানুষে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে না, বরং মানুষ ও তার স্রষ্টার মধ্যেও শান্তি প্রতিষ্ঠা করে, যাতে কোন মুসলমানের কথা ও কাজ থেকে কেবল অন্যেরাই নিরাপত্তায় না থাকে, বরং সে নিজেও খোদার ক্রোধ ও শাস্তি বা আযাব থেকে নিরাপদে থাকে – যে শাস্তি বা আযাব তার প্রাপ্য হয়ে যায় তার নিজের সীমালঙ্ঘনের জন্যই। সুতরাং, একজন মুসলামানের অর্জিত ইহজাগতিক শান্তি তার পরকাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত।

বস্তুতঃ ইসলামের শিক্ষা যদি পৃথিবীর জাতিগুলি অনুসরণ করে, তাহলে এই শিক্ষা তাদেরকে সংঘাত ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হবে। ইসলাম একটি জীবন্ত ধর্ম। ইসলাম দাবী করে যে, সে খোদার সাথে মানুষের সেই সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম যা সে স্থাপন করেছিল অতীতে। ইসলাম বিশ্বাস করে যে, হযরত নূহ্, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা (আ.) আত্মিক শান্তির যে পথসমূহ পাড়ি দিয়েছেন, এবং সর্বোপরি ইসলামের নবী (সা.) যে পথ পাড়ি দিয়েছেন তা এখনও আল্লাহ্‌র ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য প্রার্থীদের জন্য উন্মুক্ত

রয়েছে।

আহ্মদীয়া আন্দোলন

ইসলামের আহমদীয়া আন্দোলন বিশ্বাস করে যে, এই সকল দাবী এই যুগে পূর্ণতা লাভ করেছে যে ব্যক্তি-সত্ত্বার মাধ্যমে, তিনিই হচ্ছেন এর প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)। তিনি 1835 খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন ভারতের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম - কাদিয়ানে। তিনি খোদাতাআলার ফজলে এবং কৃপায় কঠোর নিয়মানুবর্তীতার সঙ্গে সঠিকভাবে ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করে সাধুতা ও ধর্মপরায়ণতার পথ পাড়ি দিতে পেরেছিলেন। এবং সর্বশক্তিমানের নিবিড় সান্নিধ্যে উপনীত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি ওহী-ইলহাম বা ঐশী বাণীপ্রাপ্ত হতেন, যার ভিত্তিতে তিনি বহু ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন- যার মধ্য থেকে অনেকগুলি অব্যর্থরূপে পূর্ণ হয়েছে তাঁর জীবদ্দশায় এবং বাকী এখনও পূর্ণ হয়ে চলেছে।

ঐশী নির্দেশের অধীনে তিনি ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা করেন 1889 খ্রিস্টাব্দে। তিনি কয়েক লক্ষ আত্মোৎসর্গীত অনুসারীর একটি বর্ধিষ্ণু সম্প্রদায় রেখে এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যান 1908 সালে। তাঁর মিশন অব্যাহত রয়েছে তাঁর সম্প্রদায়ের একের পর এক নির্বাচিত খলীফার নেতৃত্বে।

আমাদের এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর মিশনের বা সিলসিলার কার্যক্রমের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন :

"আমি প্রেরিত হয়েছি যেন আমি প্রমাণ করি যে, ইসলামই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম। এবং আমি এমন সব আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা

সৌভাগ্যমন্ডিত - যা থেকে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা বঞ্চিত এবং তারাও বঞ্চিত যারা আমাদের মধ্য থেকে আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধ হয়ে গেছে। আমি প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে প্রমাণ করে দেখাতে পারি যে, কুরআন তার শিক্ষায়, তার আলোকিত জ্ঞানে, তার গভীর সূক্ষ্ম অন্তদৃষ্টিতে এবং তার অনন্য বাক্যালংকার ও বাক্ ভঙ্গীতে এক মো'জেযা বা অলৌকিক বিষয়। এই গ্রন্থ মূসার মো'জেযাকে অতিক্রম করেছে - অতিক্রম করেছে যীশুর মো'জেযাকে শতগুণে।" (আঞ্জামে আথম, রূহানী খাযায়েন, 11তম খন্ড, পৃঃ 345,346)

তিনি (আ.) আরও বলেছেন ঃ

"আমি এই যুগের অন্ধকারে আলো। যে আমাকে অনুসরণ করে, সে রক্ষাপ্রাপ্ত হবে শয়তানের খুঁড়ে রাখা সেই সব গাড়া-গর্ত ও ডোবা' থেকে, যেগুলির মধ্যে পতিত হয় তারাই, যারা অন্ধকারে পথ হাতড়ায়। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন যেন আমি দুনিয়াকে শান্তির সহিত শান্তির মধ্য দিয়ে পরিচালিত করি এক সত্য খোদার দিকে এবং যেন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করি ইসলামের নৈতিক উৎকর্ষতা। এবং আমাকে দান করা হয়েছে স্বর্গীয় নিদর্শন যেন আমি পরিতৃপ্ত করতে পারি সত্যান্বেষীদেরকে।"- (মসীহ্ হিন্দুস্তান মে, রূহানী খাযায়েন, 15তম খন্ড, পৃঃ 13)।

এখন আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো আহমদীয়া আন্দোলনের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার রচনাবলী থেকে আর একটি উদ্ধৃতি পেশ করে, যাতে তিনি সমগ্র মানবজাতিকে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন ঃ

"যে দর্পণের মধ্য দিয়ে তোমরা সেই মহামহিমান্বিত সত্তাকে দেখতে পাবে, তা হচ্ছে - মানুষের সঙ্গে তার যোগাযোগ....... যার

হৃদয় সত্যের প্রতি আকৃষ্ট সে উঠুক এবং অন্বেষণ করুক। আমি সত্য সত্যই বলছি যে, যদি আত্মাসমূহ সাধুতার সঙ্গে অন্বেষণ করে এবং হৃদয়গুলো সত্যের জন্য পিপাসিত হয়, তাহলে লোকদের উচিত সঠিক পদ্ধতি ও সঠিক পথের সন্ধান কর। কিন্তু, এই পথ উন্মুক্ত হবে কি করে এবং কি করে এই যবনিকাই বা উন্মোচিত হবে? আমি সকল সত্যান্বেষীকে এই নিশ্চয়তা দান করছি যে, একমাত্র ইসলামই এই পথের সুসংবাদ দান করে। কেননা, অন্যেরা বহু পূর্বেই আল্লাহ্‌র বাণীর উপরে মোহর মেরে দিয়েছে। কিন্তু নিশ্চিত জেনে রাখ যে, এই মোহর আল্লাহ্ মারেন নি, - এ কেবল মানুষেরই বঞ্চনাপ্রসূত একটা কল্পিত অজুহাত মাত্র।

'আমরা যেমন আমাদের চক্ষু ছাড়া দেখতে পাই না, কর্ণ ছাড়া শুনতে পাই না, তেমনি একইভাবে আমরা কুরআন ছাড়া সেই প্রিয়তমের চেহারা দেখতে পাই না। আমি যুবক ছিলাম, আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি, আমি অদ্যাবধি এমন কাউকেই দেখিনি যে, সে সেই চরম আধ্যাত্মিক সুরা পান করেছে, অথচ এই পবিত্র ঝরণা থেকে তা পান করে নি।" - (ইসলামী উসুল কি ফিলসফী, রূহানী খাযায়েন, দশম খন্ড, পৃঃ 442-443)

নিঃসন্দেহে এই আহ্বানবাণী প্রকৃত সত্য অন্বেষণকারী প্রতিটি আত্মার জন্য জীবনদানকারী বাণী।

পরিশিষ্ট

নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ দিতেছেন যে, তোমরা আমানতসমূহকে উহাদের প্রাপককে অর্পণ কর, এবং যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার কর তখন ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার কর। আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহার উপদেশ দিতেছেন নিশ্চয় উহা অতি উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (4:59)

এবং যাহারা নিজেদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয়, নামায কায়েম করে এবং তাহাদের কাজ তাহাদের পরস্পরের পরামর্শের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়, এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা রিয্ক দান করিয়াছি উহা হইতে খরচ করে। (42:39)

নিশ্চয় ইহাতে তোমার জন্য (বিধিবদ্ধ) করা হইয়াছে যে, তুমি ইহাতে ক্ষুধার্ত থাকিবে না এবং উলঙ্গও থাকিবে না; এবং তুমি ইহাতে তৃষ্ণার্ত থাকিবে না এবং রৌদ্রেও পুড়িবে না।' (20:119-120)

এবং যখন সে শাসন ক্ষমতায় আসে তখন সে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করিবার এবং ক্ষেত-খামার ও সৃষ্টিকে বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে ছুটিয়া বেড়ায়, অথচ আল্লাহ্ অশান্তিকে ভালবাসেন না। (2:206)

ধর্মের ব্যাপারে কোন বলপ্রয়োগ নাই। (কারণ) সৎপথ ও ভ্রান্তি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে (পুণ্যের পথে বাধাদানকারী বিদ্রোহী শক্তিকে) অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে সে নিশ্চয় এমন এক সুদৃঢ়

হাতলকে মযবুত করিয়া ধরিয়াছে যাহা কখনও ভাঙ্গিবার নহে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। (2:257)

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়পরায়ণতার উপর সাক্ষী হিসাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও, এবং কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদিগকে আদৌ এই অপরাধ করিতে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার না কর। তোমরা সুবিচার কর, ইহা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী, এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, এবং তোমরা যে কাজ-কর্ম করিতেছ উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। (5:9)

কোন নবীর পক্ষে ইহা সমীচীন নহে যে, কোন যুদ্ধবন্দী রাখে যদি না সে দেশে নিয়মিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। (যদি তোমরা নিয়মিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ব্যতিরেকে যুদ্ধবন্দী রাখ সেক্ষেত্রে) তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করিতেছ (বলিয়া সাব্যস্ত) এবং আল্লাহ্ (তোমাদের জন্য) পরকাল চাহিতেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় । (8:68)

অতএব, যখন তোমরা কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হও তখন (তাহাদের) গ্রীবাদেশে সজোরে আঘাত কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা ব্যাপকভাবে তাহাদের রক্ত প্রবাহিত করিয়া (তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া) লও, তখন বন্ধনকে শক্ত কর; অতঃপর (তাহাদিগকে মুক্ত কর) অনুগ্রহ করিয়া অথবা মুক্তি-পণ লইয়া, (যুদ্ধ করিয়া যাও) যতক্ষণ পর্যন্ত না যুদ্ধ উহার অস্ত্র রাখিয়া দেয়। ইহাই হইল (প্রত্যাদেশ) এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে নিজেই তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করিতে চাহেন। এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হইয়াছে- তাহাদের কৃত-কর্ম তিনি কখনও বিনষ্ট করিবেন না। (47:5)

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর এই রসূলের এবং তাহাদের যাহারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেওয়ার অধিকারী। অতঃপর, যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ কর তাহা হইলে তোমরা উহা আল্লাহ্‌ এবং এই রসূলের প্রতি সমর্পণ কর যদি তোমরা আল্লাহ্‌ এবং শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখ। ইহা বড়ই কল্যাণজনক এবং পরিণামের দিক দিয়া অতি উত্তম। (4:60)

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট চিহ্নগুলির অবমাননা করিও না, পবিত্র মাসেরও না, কুরবাণীর জন্তুগুলিরও না, এবং ঐ জন্তুগুলিরও না যেগুলির গলায় (কুরবাণীর চিহ্ন স্বরূপ) মালা পরানো হয়, বায়তুল হারামের পথে অভিযাত্রীগণেরও না, যাহারা নিজেদের প্রভুর ফযল ও তাঁহার সন্তুষ্টির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। এবং যখন তোমরা ইহ্‌রাম খুলিয়া ফেল তখন তোমরা শিকার করিতে পার; এবং কোন জাতির এইরূপ শত্রুতা যে, তাহারা তোমাদিগকে মসজিদে-হারাম হইতে প্রতিরোধ করিয়াছে, তোমাদিগকে যেন সীমালঙ্ঘন করিতে প্ররোচিত না করে এবং তোমরা পুণ্যকাজে এবং তাক্‌ওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পর সহযোগিতা করিও না। আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ শাস্তি প্রদানে কঠোর। (5:3)

এবং আমরা তাহাদের মধ্য হইতে কতক লোককে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যের যাহা কিছু উপকরণ উপভোগ করিতে দিয়াছি উহার প্রতি তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় বিস্ফোরিত করিয়া দেখিও না, (কারণ এই সব উপকরণ তাহাদিগকে এই জন্য দেওয়া হইয়াছে যেন আমরা তদ্দারা তাহাদিগকে পরীক্ষা করি। এবং তোমার প্রতিপালকের দেওয়া রিয্‌ক সর্বোত্তম এবং অধিকতর স্থায়ী। (20:132)